19 JUN 2008

অধিকাংশ স্কুল মাদ্রাসায় বিরোধ
সরকারের বিরুদ্ধে ৬ হাজার মামলা

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাল দশা (২)

জবাবদিহিতা কম ● ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতার অপব্যবহার ● ৪০ শতাংশ স্কুলে কোন ল্যাবরেটরি নেই

নিজামুল হক ॥ রাজধানীর ক্যান্টনমেন্ট থানার বালুঘাটের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় নির্ণয়ে রীতিমতো ব্যর্থ হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এটি কলেজ নাকি স্কুল, তা নির্ণয়ে রশি টানাটানি চলছে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে। তারপরও কোনো কূলকিনারা হয়নি। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের একাংশের দাবি, এটি বালুঘাট উচ্চ বিদ্যালয়। অপর অংশের বক্তব্য, এটি বালুঘাট স্কুল এ্যান্ড কলেজ। এমন বিবাদের মধ্যেই সম্প্রতি কলেজের স্বীকৃতি বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু অধ্যক্ষের পদ ছাড়ছেন না লিয়াকত আলী। তিনি নিজের মর্জিমাফিক একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করে এখনো কলেজের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে বহিষ্কার করে দিয়েছেন বালুঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বোরহান উদ্দিনকে। এ নিয়ে শুরু হয়েছে মামলা - পাল্টা মামলা। সেই সূত্রে এক ধরনের অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এক সময়ের সুনামধারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে।

একইভাবে রাজধানীর নামকরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল মডেল স্কুল এ্যান্ড কলেজসহ দেশের ৯৫ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ চলছে। নানা দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও ব্যবস্থাপনা (২য় পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

অধিকাংশ স্কুল

(প্রথম পৃঃ পর)

কমিটির বিরুদ্ধে। কোথাও বিরোধ চলছে শিক্ষকদের সঙ্গে প্রতিষ্ঠান প্রধানের, কোথাও শিক্ষক বনাম ব্যবস্থাপনা কমিটি, আবার কোথাও বিরোধ চলছে সরকারের সঙ্গে। এসব বিরোধের সূত্রে দায়ের হয়েছে অসংখ্য মামলা-মোকদ্দমা। মামলা-পাল্টা মামলার কারণে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে। কোথাও কোথাও সৃষ্টি হয়েছে চরম অচলাবস্থা।

অনুসন্ধানে জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) তদন্তে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নানাবিধ দুর্নীতি ও অনিয়মের চিত্র পাওয়া গেছে। ডিআইএ'র রিপোর্ট অনুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দেন শিক্ষকরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে এ পর্যন্ত ৬ হাজারেরও বেশি মামলা করেছেন দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। ডিআইএ'র রিপোর্টে অভিযুক্ত শিক্ষকদের মধ্যে খুব অল্পসংখ্যকই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শাস্তি মেনে নিয়েছেন।

শিক্ষা পরিসংখ্যান বিষয়ক সরকারি দপ্তর ব্যানবেইসের তথ্য অনুযায়ী দেশে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩১ হাজার ২৫৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৯ হাজার ৭৭৮টি। এ হিসাবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ৯৫ ভাগের বেশিই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১ কোটি ৩২ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ কোটি ২৫ লাখ শিক্ষার্থী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ করছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়ার কারণে শিক্ষক- কর্মচারীদের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ ১৯৯১-৯২ সালের ৩৬৮ কোটির স্থলে বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। এ বিবেচনায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বেশি হলেও সরকার এসব প্রতিষ্ঠানের তদারকির বিষয়ে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেনি। ফলে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলছে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি। সরকারি হিসাবে স্বাধীনতার পর তিন যুগে দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৪ গুণ। একইসঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার বেড়েছে ৬ গুণ, শিক্ষক- কর্মচারীর সংখ্যা বেড়েছে ৫ গুণ এবং শিক্ষা খাতে সরকারি ব্যয় বেড়েছে ১০ গুণ। কিন্তু তুলনামূলকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানের তেমন কোন উন্নতি হয়নি।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার হচ্ছে। কোথাও টাকার বিনিময়ে, আবার কোথাও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে অযোগ্য লোকদের শিক্ষক পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক বিবেচনায় অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগদানের ঘটনাও ঘটেছে। আবার পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সুপারিশ অনুযায়ী এসব শিক্ষকের এমপিও বাতিল করলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা কর্মচারী আদালতে মামলা ঠুকে দিচ্ছেন। সরকারি তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা মিথ্যা তথ্য দিয়ে এবং জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে গত ৬ বছরে সরকারি তহবিল থেকে অতিরিক্ত ১৬০ কোটি টাকারও বেশি তুলে নিয়েছেন।

মাধ্যমিক স্তরসহ সামগ্রিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে অধিদপ্তরসহ স্থানীয় অফিসগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এছাড়া ব্যবস্থাপনা কমিটির হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকায় তারা শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়মে জড়িয়ে পড়ছে। নীতিমালার বাইরে গিয়ে অবৈধ উপায়ে নিয়োগ দেয়ার কারণে ইতিমধ্যেই অপ্রয়োজনীয় শিক্ষকের সংখ্যা ৩০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। নিয়ম বহির্ভূত উপায়ে নিয়োগ পাওয়া এসব শিক্ষকের মধ্যে ৫২ শতাংশই স্নাতক পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত, ৩৪ শতাংশ দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত এবং প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা ১ শতাংশেরও নিচে। যোগ্যতাসম্পন্ন ও মেধাবীরা এ পেশায় নিয়োগ পাচ্ছে না বলেই শিক্ষার মান দিন দিন নিম্নমুখী।

সরকারি এক জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ১৯ হাজার ৩৯০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন ব্যবস্থাপনা কমিটি নেই। ৮০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে এডহক কমিটি দিয়ে চলছে। ৮ হাজার ৪০৮টি মাদ্রাসার মধ্যে ৯৭টি মাদ্রাসায় কোন কমিটি নেই। ৪৪৮টি মাদ্রাসা এডহক কমিটি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। শিক্ষকদের সঙ্গে প্রধান শিক্ষকের এবং ম্যানেজিং কমিটির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বিঘ্নিত হচ্ছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে বলা হয়, দেশে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য বর্তমানে যে নীতিমালা রয়েছে তা মানছে না অধিকাংশ কর্তৃপক্ষ। দেশের ৩৭২টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল, ৯৪৮টি মাধ্যমিক স্কুল, ২৬২টি দাখিল মাদ্রাসা, ৩৩টি আলিম মাদ্রাসা, ৭৯৭টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ এবং ডিগ্রী পর্যায়ের ১৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নীতিমালা অনুসারে ন্যূনতম শিক্ষার্থী নেই। অথচ দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সাড়ে ৫ হাজার। সাড়ে ৬ হাজার প্রতিষ্ঠানে ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত শিক্ষক রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, ল্যাবরেটরি, খেলার মাঠ, আবাসিক হল, প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষ, ক্যান্টিন সুবিধা, প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণসহ ভৌত অবকাঠামো ও পরিবেশগত মানের সংকট থাকার বিষয়টিও জরিপ রিপোর্টে বলা হয়। দেশের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় সবগুলোতেই শ্রেণীকক্ষের অভাব রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই কাঁচা ও সেমিপাকা। শিক্ষার্থী অনুপাতে শ্রেণীকক্ষ অপ্রতুল। শতকরা ৭ ভাগ থেকে ১০ ভাগ প্রতিষ্ঠানে পানীয় জলের অভাব রয়েছে। ৬ শতাংশ স্কুলে টয়লেট নেই। এছাড়া ৪০ ভাগ স্কুল, ২২ ভাগ কলেজ ও অধিকাংশ মাদ্রাসায় কোন ল্যাবরেটরি নেই। শ্রেণীকক্ষে একজন শিক্ষক যথাসময়ে উপস্থিত হন কিনা, শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের পূর্বে প্রস্তুত হন কিনা, শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন কিনা এ বিষয়ে কোন নজরদারির ব্যবস্থা নেই। শিক্ষকরা নিয়মিত এবং যথাসময়ে ক্লাসে হাজির হন কিনা এ নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধানের কোন বিধি-নিষেধ থাকে না।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে, ৮০ শতাংশ শিক্ষক পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই ক্লাসে যান, ৮৫ শতাংশ শিক্ষক শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করেন না। এছাড়া জরিপকালে দেখা গেছে যে, বিপুলসংখ্যক শিক্ষক কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই প্রতিষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকেন।